জল পড়ে পাতা নড়ে

প্রো-অ্যাকটিভ, রিঅ্যাকটিভ অথবা কিছুই না

মুহম্মদ জুবায়ের

দেশের বাইরে আমরা যারা বসবাস করি, তারা দেশের ভালো কিংবা মন্দ কোনোটারই উত্তাপ সরাসরি ভোগ করি না। তবু বাংলাদেশে সামান্যতম ভালো কিছু ঘটেছে জানলে গর্বে বুক ভরে ওঠে, অহংকারে পা ফেলি মাটি থেকে দুই ফুট ওপরে। কিন্তু সে সুযোগ কালেভদ্রে আসে। সত্যি কথা বলতে কি, ভালো-র ভাগ্য কি আমাদের আছে? দেশ থেকে আসা বা দেশে ঘুরে আসা কারো মুখে একই কথা শুনি, 'দেশ একেবারে বাসের অযোগ্য হয়ে যাচ্ছে।' চুপ করে শুনি, বিশ্বাস করতে চাই না। একটা সময় ছিলো যখন মৃদু প্রতিবাদ করার চেষ্টা করতাম এই বলে যে, 'দেশের অবস্থা ভালো ছিলো কবে? এর চেয়ে বেশি খারাপ হওয়ার কি আছে? আস্তে আস্তে একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে।' হয় না। মুখে বলাই সার। খুব ভরসা নিয়ে বলা তো নয়। অথচ আজকাল ওইটুকু বলারও সাহস হয় না, শুধু শুনে যেতে হয়। ইন্টারনেটে প্রতিদিন সাত-আটটি দৈনিক কাগজের শিরোনামে পেয়ে যাই যাবতীয় দুঃসংবাদ, অযৌক্তিক ও উদ্ভট সব কাণ্ডকীর্তির বিবরণ আর বীভৎস ছবি (সবগুলো ছবি ইন্টারনেট সংস্করণে আসে না তাই রক্ষা)। মন-খারাপ করাই যেন প্রতিদিনের নিয়তি।

লক্ষ্য করার ব্যাপার, এইসব দুঃসংবাদের অধিকাংশই রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। 'গুড গভর্নেন্স' জিনিসটি বাংলাদেশে হয়ে উঠেছে 'নো গভর্নেন্স'। প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা দুই প্রকারের হয়ে থাকে, তা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে হোক বা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় – 'প্রো-অ্যাকটিভ' এবং 'রিঅ্যাকটিভ'। দক্ষ ও সফল প্রশাসকরা 'প্রো-অ্যাকটিভ' হয়ে থাকেন। ভবিষ্যতে সম্ভাব্য সংকট এড়ানোর জন্যে এবং সংকট হলে উতরে যাওয়ার জন্যে তাঁরা এক বা একাধিক পরিকল্পনা বা ছক প্রস্তুত রাখেন। কোনো সংকটময় পরিস্থিতিতে হতবিহ্বল হওয়ার মধ্যে কোনো কৃতিত্ব নেই। 'রিঅ্যাকটিভ'-রা (পড়তে হবে বাংলাদেশের প্রশাসন) ভাবনাচিন্তার ধার ধারেন না, কথিত গল্পের সেই 'দেখি না, চোর ব্যাটা কি করে' বলে মুখ গুঁজে পড়ে থাকেন, সংকট উপস্থিত হলে 'আরে কোথায় কি' জাতীয় ছেলেভোলানো বুলি জপ করেন। অবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাই-যাই হয়ে গেলে দিশাহারা হন এবং অবিলম্বে অন্যের ঘাড়ে (পড়তে হবে বিরোধী দল এবং বাইরের কোনো শক্তি) দোষ চাপাতে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। সারাদেশে জঙ্গি তৎপরতা ও বোমাবাজি, কানসাটের বিদ্যুৎ আন্দোলন – এসব অতি সাম্প্রতিক ঘটনায়ও ব্যতিক্রম হয়নি। বর্তমান ও অতীতের শাসকরা কখনো কখনো এমনকি 'রিঅ্যাকটিভ'-ও নন। যেন কিছুতেই কিছু এসে যায় না। এর শত-সহস্র উদাহরণ দেওয়া সম্ভব, প্রতিদিনের সংবাদপত্রে এগুলো পাওয়া যায় ডজন হিসেবে।

'প্রো-অ্যাকটিভ' কার্যকলাপ যে একেবারে নেই তাই বা কী করে বলি? মুশকিল হলো, আমাদের সরকার 'প্রো-অ্যাকটিভ' হলে যা হয় তার ফল ভোগ করে আমজনতা – বিরোধী দলের মহাসমাবেশের আগে অজস্র নিরীহ মানুষের গণগ্রেফতারের ঘটনা আমরা দেখেছি। বিরোধী দলগুলি প্রধানমন্ত্রীর অফিস অবরোধের কর্মসূচী দিলো। আমাদের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী এমন 'প্রো-অ্যাকটিভ' হয়ে উঠলো যে সারা ঢাকা শহর কার্যত তারাই অবরোধ করে রাখলো। বিরোধী দলের কর্মসূচী সফল করে দিলো সরকারি পুলিশ। ভোগান্তি জনগণের, হাজতবাস এবং পুলিশের পিটুনিও তাদেরই ভাগে।

প্রধান বিরোধী দলের এক গণকণ্ঠাকুর একবার বললেন, সরকারের পতন ঘটবে ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে। তখন সরকার পতনের মতো কোনো পরিস্থিতি ছিলো বলে কারো ধারণা হয়নি, সংগঠিত কোনো আন্দোলন বা বৃহৎ কোনো দৃশ্যমান সংকটও ছিলো না। 'প্রো-অ্যাকটিভ' সরকারও সেই ভবিষ্যত-গণনায় আস্থা রেখে হাজার হাজার মানুষকে হাজতে ভরে দিলো। ওই তারিখের পরেও গোটা দুয়েক ৩০শে এপ্রিল গেছে, সরকার বহাল তবিয়তে অধিষ্ঠান এখনো। লোকহাসানো এবং দলের বিশ্বাসযোগ্যতায় বড়ো ধরনের চোট খাওয়ানো এই গণকণ্ঠাকুর সম্প্রতি আবার 'প্রো-অ্যাকটিভ' ঘোষণা দিয়েছেন যে পাঁচটি টিভি চ্যানেল তাঁরা বয়কট করবেন। কেন? না, এই মর্মে দৈব বার্তা নাজেল হয়েছে যে, ওই টিভি চ্যানেলগুলি নির্বাচনের সময় তাঁর দল বা জোটের বিরুদ্ধে অপপ্রচার বা ষড়যন্ত্রমূলক প্রচার চালাবে। তা একেবারে অসম্ভব নয়। কিন্তু তার সামান্যতম কোনো আলামতও এখন পর্যন্ত কেউ দেখেনি। সুতরাং এই ঘোষণা যে দৈববাণীর ফল, তাতে আর সন্দেহ কি? আমাদের মন্ত্রীরা কথায় কথায় বিদেশী ষড়যন্ত্র খোঁজেন কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়াই, বিরোধীপক্ষের কথাবার্তাও একই রকম অপরিণামদর্শী। এই ধরনের অদূরদর্শিতা ও বালখিল্যতা নিয়ে আর যাই হোক রাজনীতি হয় না, তা দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতার নমুনা নয়।

'রিঅ্যাকটিভ' আচরণের ফলাফল দেখা যাক। সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ কানসাট। বিদ্যুৎ ঘাটতির সমস্যা আজকের নয়, তিন তিনটি নির্বাচিত সরকার ক্রমবর্দ্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানোর জন্যে বস্তুত কিছুই করেনি। অথচ সব আমলেই আমরা উন্নয়নের জোয়ারের গল্প শুনে আসছি। উন্নয়ন ও শিল্পায়নের জন্যে বিদ্যুৎ যে একটি জরুরি উপাদান, তা কি কেউ এদের মগজে ঢোকাতে পেরেছে? সেরকম নমুনা দেখা যায় না। বিদ্যুতের দাবি, যা মূলত একটি মৌলিক দাবি, জানাতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে ২০ জনের মৃত্যু। ফলাফল? জনতার দাবি না মেনে উপায় থাকলো না সরকারের। সময়মতো তৎপর হলে এই ২০ জন নিরপরাধ মানুষের প্রাণ খোয়ানোর দরকার হতো না।

অতি সম্প্রতি প্রাথমিক স্কুলশিক্ষকদের আন্দোলনেও ব্যতিক্রম কিছু ঘটেনি। তাঁরা স্কুল বন্ধ করে অনশনে গেছেন, আত্মাহুতির ঘোষণাও দিলেন। প্রথমদিকে সরকারি কোনো উদ্যোগ-তৎপরতা দেখা যায়নি, না দাবিদাওয়া মানার ব্যাপারে, না নিবৃত্ত করে স্কুল খোলা রাখার ব্যাপারে। শিক্ষকরা দাবিদাওয়া নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দিতে যাবেন, পুলিশ তাঁদের যেতেই দিলো না। শিক্ষকরা অস্ত্রধারী দুর্বৃত্ত নন (দুর্বৃত্তরাও প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনায়াসে যেতে পারে এবং আগের আমলেও পারতো বলে শোনা যায়), কারো কাছে কোনো আশা-ভরসা না পেয়ে তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলে তা কি দোষের? প্রশাসনের সর্বোচ্চ ব্যক্তি হিসেবে তিনিই তো রাষ্ট্রের ও জনগণের নির্বাচিত অভিভাবক।

আন্দোলনকারী শিক্ষকরা বলছেন, তাঁদের দাবিদাওয়া বর্তমান সরকারের প্রাক-নির্বাচনী ইশতেহারের অংশ, সুতরাং তাঁদের আন্দোলন ন্যায়সঙ্গত। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি যদি না হয়, তবুও দাবিগুলিকে কেউ অযৌক্তিক বলবেন না। অবস্থা যখন সংকটাপন্ন, অনশনকারী শিক্ষকদের কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে গেলেন, সেই সময় প্রধানমন্ত্রীর ধমক শোনা গেলো : 'আপনারা কাজে ফিরে যান।' তিনি জানালেন, আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে প্রাথমিক স্কুলশিক্ষকদের (বাংলাদেশে পেশাজীবীদের মধ্যে সম্ভবত তাঁরাই সবচেয়ে হতদরিদ্র, তাঁদের প্রাইভেট টিউশনি বা কোচিং-এর বাড়তি রোজগারের সুযোগ অতি সীমিত) দাবি মানা সম্ভব নয়। তা না হয় বোঝা গেলো, কিন্তু এই কথাটি জানাতে এতো সময় লাগলো কেন?

তার চেয়েও দুঃখজনক এবং পরিহাসমূলক সংবাদ ওইদিনের কাগজেই আছে। ১০০ কোটি টাকায় প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্যে কয়েকটি হেলিকপ্টার কেনার ব্যবস্থা হচ্ছে। টেন্ডারের অনিয়মের কথা না হয় বাদ দেওয়া গলো, বাংলাদেশে অনিয়মই নিয়ম। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষকদের যখন ছেলেভোলানোর মতো

করে আর্থিক অসামর্থ্যের কথা বলা হচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তে এই হেলিকপ্টার-বিলাসিতার খবর নিদারুণ পরিহাস ছাড়া আর কি? এই ১০০ কোটি টাকা ব্যয় করে আমাদের কোন কল্যাণ হবে? আমাদের নিরাপত্তা ঠিক কী পরিমাণ বাড়বে? প্রতিরক্ষার ঠিক কোন সংকটের উপশম হবে? অথচ সাধারণ বুদ্ধিতে বোঝা সম্ভব যে ১০০ কোটি টাকার বরাদ্দে এই শিক্ষকদের দাবির আংশিক পূরণ করা যেতো। এই শিক্ষকরা যে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ভবিষ্যৎ নির্মাণের সর্বপ্রথম কারিগর, তা অস্বীকার করবে কে? কথা উঠতে পারে বাজেট বরাদ্দ নিয়ে। কিন্তু টানাটনিরর সংসারে এক খাতের টাকা অন্য খাতে খরচ করা অস্বাভাবিক কিছু নয়, বাংলাদেশ নামের গরিব রাষ্ট্রে কখনো যে তা হয়নি, তা-ও নয়। আর নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষকদের জীবন-জীবিকার মানোন্নয়ন বাবদ কিছু অর্থ বরাদ্দ কি করা যেতো না বাজেটে? যেতো, কিন্তু হয়নি। সঠিক জানা নেই, তবে সন্দেহ করি যে নতুন বাজেটেও এই বাবদে কোনো বরাদ্দ রাখা হয়নি (অনুমান ভুল হয়ে থাকলে সরকারকে সাধুবাদ এবং আজগুবি সন্দেহ বাতিকের কারণে নিজেকে প্রবল ধিক্কার আগাম দিয়ে রাখি)। অতিশয় নিরীহ অসহায় শিক্ষকদের কথা কে আর ভাবে? তাঁরা আছেন, থাকবেন। যাওয়ার তো নেই কোথাও।

আমজনতারও কোথাও যাওয়ার নেই। সামনে এমন কেউ নেই যার দিকে ভরসার চোখ তুলে তাকানো যেতে পারে। কী যে হবে আমাদের!

email : mz1971@gmail.com